একক ০৫ ❑ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মূল নীতিসমূহের উদ্ভব (সংশোধনসহ)

গঠন

০৫.১ উদ্দেশ্য

০৫.২ প্রস্তাবনা

০৫.৩ ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং সংবিধান রচনা ও গ্রহণ

০৫.৪ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ

০৫.৫ সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি

০৫.৬ ব্রিটেন ও আমেরিকার সংবিধানের তুলনা

০৫.৭ সারাংশ

০৫.৮ প্রশ্নাবলী

০৫.৯ উত্তরমালা

০৫.১০ গ্রন্থপঞ্জী

০৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের পদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তন সম্বন্ধে আপনাদের অবহিত করা। এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্মগ্রহণের পটভূমি;
- মার্কিন সংবিধান রচনা ও গ্রহণের বৃত্তান্ত;
- মার্কিন সংবিধানের সম্প্রসারণ;
- মার্কিন সংবিধানের পদ্ধতি ও সংবিধানের সংশোধনসমূহ।

এগুলি সম্বন্ধে অবহিত হলে আপনি আমেরিকার শাসনব্যবস্থার মূল নীতিগুলির সঙ্গে পরিচিত হবেন।

০৫.২ প্রস্তাবনা

এই এককে আমরা আমেরিকার সংবিধানের ঐতিহাসিক পটভূমিকার ভিত্তিতে সংবিধান রচনা ও গ্রহণ, সংবিধানের

সম্প্রসারণ, সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি আলোচনা করব। তাছাড়াও ব্রিটেন ও আমেরিকার সংবিধানের তুলনার ভিত্তিতে আমেরিকার সংবিধানকে বোঝার চেষ্টা করব।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন আমেরিকায় ১৩টি উপনিবেশ গড়ে তোলে এবং ১৭৬৩ থেকে নানারকম কর ও দমনমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্রিটেনের বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করে। ফলে আমেরিকার বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়। তেরটি উপনিবেশেই প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ব্রিটিশ সরকারের বলপ্রয়োগ নীতি ও শুষ্ক নীতির বিরুদ্ধে ১৭৭৫ সালে উপনিবেশবাদীদের যুদ্ধ শুরু হয়। ৪ঠা জুলাই,১৭৭৬ সালে ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণা করা হয়। ১৭ই নভেম্বর ১৭৭৭ সালে ১৩ টি উপনিবেশ মিলে রাষ্ট্র সমবায় (Confederation) গঠন করে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা ঘোষণা মেনে নেয় না। শেষে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে যুদ্ধে ১৭৮৩ সালে আমেরিকার উপনিবেশগুলি জয়লাভ করে স্বাধীনতা লাভ করে।

রাষ্ট্রসমবায়ের মধ্যে অনৈক্য ও নানা অসুবিধা দেখা দেওয়ায় ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়ায় সমবায়ী রাষ্ট্রগুলির একটি কনভেনশনে নতুন সংবিধান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৭৮৯ সালে নতুন সংবিধান গৃহীত হয়। সংবিধানটি ছিল ক্ষুদ্র। তাতে প্রস্তাবনাসহ সাতটি অনুচ্ছেদ ছিল। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, প্রথা ও রীতিনীতি এবং রাষ্ট্রপতিদের শাসনবিভাগীয় ভূমিকার মাধ্যমে সংবিধানটি ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে বর্তমান রূপ পেয়েছে।

১৭৮৯-এর আমেরিকার সংবিধান জনগনের সার্বভৌমত্ব, লিখিত শাসনতন্ত্র, দুষ্পরিবর্তনীয়তা, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি, রাষ্ট্রপতির শাসন, জনগণের মৌলিক অধিকার, বিচারবিভাগের প্রাধান্য, যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতি, দ্বৈত নাগরিকতা, রাজ্যগুলির সমতা ও স্বতন্ত্র সংবিধান, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, সীমাবদ্ধ শাসন ও প্রতিনিধিমূলক শাসন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছিল। সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থাও সংবিধানে লিখিত আছে। আমেরিকার সংবিধান সংশোধন ব্যবস্থাটি জটিল ও কষ্টসাধ্য, তাই আমেরিকার সংবিধানকে দুষ্পপরিবর্তনীয় বলা হয়।

ব্রিটেন ও আমেরিকার দুটি উদারনীতিবাদী ধনতান্ত্রিক দেশ। দুটি দেশেই গণতন্ত্র, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও দ্বিদল ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রকৃতিগত দিক থেকে আমেরিকার শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রপতিশাসিত ও যুক্তরাষ্ট্রীয় আর ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা সংসদীয় ও এককেন্দ্রিক। তাই উভয় দেশের শাসনব্যবস্থায় মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

০৫.৩ ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং সংবিধান রচনা ও গ্রহণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুশো বছরের কিছু বেশি ইতিহাসে দেশটি বিশ্বে তার মর্যাদা ও প্রতিপত্তি সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ প্রসঙ্গে শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মার্কিন শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি ঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পটভূমিকা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরে কানাডা, দক্ষিণে মেক্সিকো ও মেক্সিকো উপসাগর, পূর্বদিকে আটলান্টিক মহাসাগর এবং পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। সমগ্র দেশ জুড়ে আছে উঁচু উঁচু পাহাড়, বিস্তৃত উপত্যকা, বড় বড় নদনদী এবং উর্বর সমভূমি। খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদে দেশটি সমৃদ্ধ। জাতিগতভাবে মার্কিনিরা বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিভিন্ন জাতির জীবনধারা ও ঐতিহ্যের মিলনে মার্কিনিদের উদ্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অভিবাসীদের দেশ বলা হয়। এখানে বহু ভারতীয় উপজাতি, স্ক্যানিনেভিয়ার ভাইকিংস উপজাতি ও স্পেনীয়রা বসবাস করছেন। ইংল্যান্ড,হল্যান্ড ও ইউরোপের পশ্চিমঞ্চলের বিভিন্ন দেশ থেকে এই অঞ্চলে বহু মানুষ আসেন। বিভিন্ন জাতির ঐতিহ্য ও জীবনধারার মধ্যে ব্রিটিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব মার্কিনিদের ওপর সব থেকে বেশি।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যস্থাপনে ইংল্যান্ড প্রথম পদক্ষেপ নেয় ১৫৭৮ সালে। ওই সময় স্যার হামফ্রি হিঙ্গালবার্টকে ইংল্যান্ডের রানি দুরবর্তী ও আদিম অঞ্চলে বসবাস ও ওইসব স্থান দখল করার অনুমতি দেন। দুবছর পর ইংল্যান্ডের রানী সেন্ট লরেন্স নদী ও ফ্লোরিডার মধ্যবর্তী অঞ্চলটিকে ইংরেজদের বসতিস্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট করে ওই অঞ্চলের নাম দেন ভার্জিনিয়া। ওই অঞ্চলে বসতিস্থাপনের দায়িত্ব দেন ওয়াল্টার র‍্যালের হাতে। আমেরিকায় বসতিস্থাপনের জন্য ইংরেজ ব্যবসায়ীরা উদ্যোগী হয়। ইউরোপে চার্চের সঙ্গে যাদের বিরোধ হয়েছিল তারাও উত্তর আমেরিকায় তাদের প্লাইমাউথ ও লন্ডন কোম্পানিকে আমেরিকার বিশেষ কয়েকটি স্থানে বসতিস্থাপনের অধিকার দেন। ১৬২০ সালে কিছু পিলগ্রিম (ধর্মীয় ভেদবাদী), ১৬৩৪সালে একদল ক্যাথলিক এবং ১৬৮২ সালে কোয়েকাররা যথাক্রমে ম্যাসচুসেটস, মেরিল্যান্ড ও পেনসিলভ্যানিয়ায় উপস্থিত হয়। ১৭০০ সালের মধ্যে ম্যাসচুসেটস থেকে ক্যারোলিনা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে ইংরেজদের জনপদ গড়ে ওঠে। ইংল্যান্ড থেকে আসা অধিবাসীদের মাধ্যমে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, অভিজ্ঞতা, চিন্তাধারা, আইন ইত্যাদি আমেরিকার ভূখন্ডে বাহিত হয়ে আসে।

শুরুতে উপনিবেশগুলির শাসনব্যবস্থা ইংল্যান্ডের ব্যবসায়ী ও রাজার প্রিয় ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত ছিল। তারা রাজার ফরমান অনুসারে উপনিবেশগুলিতে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৩ টি উপনিবেশের সবগুলিতেই আইনসভা দ্বারা আইন প্রণীত হত। কানেক্‌টিকাট রোড আইল্যান্ড তাদের গভর্নরকেও নির্বাচিত করত। তবে অন্যগুলিতে রাজাই গভর্নরদের নিয়োগ করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংল্যান্ডের রাজার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকত। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে (১৭৬৩) স্পেন ও ফ্রান্স হটে যাবার পর ইংল্যান্ডের স্বার্থের যুপকাষ্ঠে আমেরিকার বাণিজ্যিক স্বার্থকে বলি দেওয়া শুরু হয়। সেখানে নানারকম কর বসিয়ে ইংল্যান্ডের কোষাগার বৃদ্ধির চেষ্টা চলে। ১৩ টি উপনিবেশেই প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তারা জানায় যে উপনিবেশগুলিতে করধার্যের ক্ষমতা শুধু সেখানকার আইনসভাগুলিই ভোগ করে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার নতুন কর বসাতে থাকলে সর্বত্র ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৭৭০ সালের বোস্টন শহরে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে ঔপনিবেশিকদের সংঘর্ষ শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক আইন ও আর্থিক নীতি ঔপনিবেশের ব্যবসায়ীদের স্বার্থবিরোধী ছিল। মাতৃভূমি ব্রিটেনের সঙ্গে ১৩টি উপনিবিশের সম্পর্কে তিক্ত হয়ে দাঁড়ায়। নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে তারা সচেতন হতে থাকে।

১৭৭৪ সালে ফিলাডেলফিয়াতে প্রথম মহাদেশীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ভার্জিনিয়ার জর্জ ওয়াশিংটন ও প্যাট্রিক হেনরি, মাস্যাচুসেটসের জর্ন ও সামুয়েল আডামন ইত্যাদি ৫৬ জন প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে যোগ দেন। এখানে ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক আইন ও রাজস্বসংক্রান্ত নিয়মনীতির নিন্দা করা হয় এবং বলা হয় যে শুধুমাত্র প্রাদেশিক আইনসভাগুলিই তাদের নিজেদের সম্বন্ধে আইনপ্রণয়নের অধিকারী।

ব্রিটিশ সরকার দমনমূলক শুল্কব্যবস্থা ও বলপ্রয়োগ নীতির পরিবর্তন না করায় ১৭৭৫ সালে ফিলাডেলফিয়ায় দ্বিতীয় কংগ্রেস শুরু হয়। এতে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, উইলসন, জেফারসন ইত্যাদি নেতারা যোগ দেন। অবশ্য কিছু রক্ষণশীল নেতা যোগ দেননি।

দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেসের অল্পদিন আগেই উপনিবেশবাসীদের সঙ্গে ব্রিটেনের যুদ্ধ শুরু হয়। উপনিবেশগুলির সামরিক বাহিনীর অধ্যক্ষ পদে জর্জ ওয়াশিংটনকে নিযুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেস ১৪ মাস ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়নি।

১৭৬৩ থেকে গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলেও ১৭৭৫-এর আগে পর্যন্ত সব ঔপনিবেশিকদেরই লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে থেকে নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন। গ্রেট ব্রিটেনর সঙ্গে সমঝোতায় আসাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু তাদের ন্যায্য দাবিগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন মেনে না নেওয়ায় শেষ পর্যন্ত উপনিবেশগুলির জনগণ স্বাধীনতা ঘোষণার দাবি তোলে। ১৭৭৫ সালে লেক্সিংটন যুদ্ধের পর তারা ব্রিটেনের সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করে। রক্ষণশীল নেতারা ঔপনিবেশগুলির স্বাধীনতা ঘোষণা ও ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার বিরোধী ছিলেন। তাদের সঙ্গে স্বাধীনতাকামীদের সর্বত্র যুদ্ধ চলে।

১৭৭৬ সালের ৭ই জুন দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেস ঔপনিবেশগুলির স্বাধীনতার দাবি সম্পর্কিত প্রস্তাব সমর্থিত হয়। ১০ই জুন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের খসড়া রচনার জন্য কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ২৮শে জুন রিপোর্ট পেশ করে এবং ৪ঠা জুলাই ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র চূড়ান্তভাবে স্বাক্ষরিত হয়।

১৭৭৭ সালের ১৭ই নভেম্বর ১৩টি উপনিবেশ চুক্তির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি রাষ্ট্রসমবায় গঠন করে। ১৭৮১ সালে চুক্তিপত্রটি বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি অনুমোদন করে। চুক্তিপত্র অসুসারে রাষ্ট্রসমবায়ের পরিচালনার জন্য মহাদেশীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসই আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত ১৭৮৩ সালে আমেরিকার উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করে।

রাষ্ট্র-সমবায়ের সংবিধান অনুসারে মহাদেশীয় কংগ্রেসের মুখ্য দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্র-সমবায়ের পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তিস্থাপন, সন্ধিচুক্তি সম্পাদন, সেনাবাহিনী গঠন, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সুদৃঢ়করণ ইত্যাদি। সংবিধান অনুসারে বিচারকাজ পরিচলনার জন্য একটি সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়।

রাষ্ট্র-সমবায়ের কিছু কাঠামোগত দুর্বলতা ছিল। করধার্য, ঋণগ্রহণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে রাষ্ট্র-সমবায়ের কোনো ক্ষমতা ছিল না। ফলে রাষ্ট্র সমবায় ও মহাদেশীয় কংগ্রেসকে বহু পরিমাণে সমবায়ী রাষ্ট্রগুলির ওপর নির্ভর করতে হত। কিন্তু রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও কর্তৃত্বের ব্যাপারে সচেতন ছিল। তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্যের অভাবে রাষ্ট্র-সমবায়কে নানা অসুবিধায় পড়তে হত।

রাষ্ট্র-সমবায়ের সংবিধানের এই অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য হ্যামিলটনের উদ্যোগে ১৭৮৭ সালে কংগ্রেসের কাছে রাষ্ট্র-সমবায়ের চুক্তি সংশোধনের জন্য আবেদন জানানো হয়। ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়ায় ওয়াশিংটনের নেতৃত্ব সমবায়ী রাষ্ট্রগুলির একটি কনভেনশন ডাকা হয়। এই কনভেনশনে নতুন অঙ্গারাজ্যই এই নতুন সংবিধান অনুমোদন করে। ওয়াশিংটন রাষ্ট্রপতি হিসাবে ৩০ শে এপ্রিল কার্যভার গ্রহণ করেন। প্রথমে ১৩ টি রাজ্য থাকলেও পরে রাজ্যের সংখ্যা বেড়ে ৫০ হয়। এই সংবিধান অনুসারে মার্কিন যুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রস্তাবনা ও ৭টি অনুচ্ছেদ নিয়ে সংবিধানের শুরু হয়েছিল। পরে কিন্তু সংশোধনের সংযুক্তি ঘটেছে। তাছাড়াও কিন্তু শাসনতান্ত্রিক প্রথা ও রীতিনীতি, কংগ্রেস প্রণীত আইন ও সুপ্রিম কোর্টের রায়ের মাধ্যমে সংবিধানটি সম্প্রসারিত ও বিকশিত হয়েছে।

০৫.৪ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১৭৮৭ সালে গৃহীত ফিলাডেলফিয়া কনভেনশন গৃহীত মার্কিন সংবিধান খুবই সংক্ষিপ্ত—মুদ্রিত দশ পাতার বেশি নয়। এই লিখিত ক্ষুদ্র সংবিধানটি পরবর্তীকালে প্রথা, রীতিনীতি, বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত, আইনসভা প্রণীত আইন ইত্যাদির দ্বারা সম্প্রসারিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। মার্কিন সংবিধানের এই সাধারণ চরিত্র স্মরণ রেখে আমরা এবার তার বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর আলোচনাও করব।

(১) জনগণের সার্বভৌমত্ব ঃ সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে '' আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ অধিকতর সার্থক এক রাজ্যসংঘ গঠন, ন্যায়প্রতিষ্ঠা, আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা সুনিশ্চিতকরণ যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন, জনগণের কল্যাণবৃদ্ধি এবং আমাদের ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য স্বাধীনতা সম্ভব করার উদ্দেশ্য যুক্তরাষ্ট্রের এই সংবিধান বিধিবদ্ধ ও প্রতিষ্ঠা করলাম। (We, the people of United States; in order to from a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defence, promote the general welfare and secure the blessings of liberty of ourselves and our posterity, to ordain and establish the constitution for the United States) সংবিধানের প্রস্তাবনা সুস্পষ্টভাবে জনগণের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেছে। সংবিধানের অধীনে প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হল জনসম্মতি, বা গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ।

(২) লিখিত শাসনতন্ত্র ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান বলা যায়। শাসনতান্ত্রিক বিধি ও আইন এখানে একটি নির্দিষ্ট দলিলে লিখিতভাবে সন্নিবিষ্ট আছে। ব্রিটেনের মত আমেরিকার

সংবিধান অলিখিত হয়। পরবর্তীকালে আমরা ভারতবর্ষ, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি দেশেও লিখিত সংবিধান পেয়েছি। আমেরিকায় সংবিধান একদিকে কেন্দ্রীয় ও অঙ্গারাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করেছে, অন্যদিকে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ দ্বারা প্রত্যেক বিভাগের ক্ষমতা প্রয়োগের এলাকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তবে বিগত ২১২ বছরের বিবর্তনের মাধ্যমে অনেক অলিখিত অংশ সাংবিধানিক মর্যাদালাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও প্রভাব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সংবিধান প্রণেতারা আমেরিকার সংবিধানের মৌলিক নীতিগুলিই নির্দেশ করেছিলেন। কালের বিবর্তনে সেই মৌলিক নীতিগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই কিছু অলিখিত অংশ সংবিধানগতভাবে গুরুত্ব লাভ করেছে।

(৩) দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান ঃ আনুষ্ঠানিক সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির দিক থেকে মার্কিন সংবিধান খুবই দুষ্পরিবর্তনীয়। এটি সংশোধন করতে গেলে দুটি পর্যায় দেখা যায়—(১) সংশোধনী প্রস্তাব কংগ্রেসের উভয় কক্ষের দুই তৃতীয়াংশের সংখ্যা গরিষ্ঠতা বা দুই-তৃতীয়াংশ অঙ্গারাজ্যের অনুরোধক্রমে কংগ্রেস কর্তৃক আহূত এক সভায় গ্রহণ করতে হবে। (২) ওই প্রস্তাব আবার অঙ্গ রাজ্যগুলিতে ওই উদ্দেশ্যে আহূত সভার অন্তত তিন-চতুর্থাংশ দ্বারা বা আইনসভাগুলির তিন-চতুর্থাংশ দ্বারা সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন। সংশোধনী প্রস্তাব এভাবে গৃহীত ও সমর্থিত হলে তবেই আমেরিকার সংবিধানের সংশোধন সম্ভব। সংশোধন পদ্ধতির এই জটিলতার ও দুঃসাধ্যতার জন্য আমেরিকার সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় বলা হয়। আমেরিকার সংবিধান জটিল সংশোধন পদ্ধতির জন্য গত ২১২ বছরে মাত্র ২৬ বার সংশোধিত হয়েছে।

বাস্তবে দুষ্পবরিবর্তনীয় হলেও কার্যত আমেরিকার সংবিধানের রূপ সুপরিবর্তনীয়। সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে সংবিধানকে সময়ের পরিবর্তনের সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য প্রদান করেছে এবং সংবিধানকেও গতিশীল হতে সাহায্য করেছেন। অলিখিত রীতিনীতি ও প্রথা দ্বারা সংবিধান পরিবর্তিত হয়েছে। তাই মুনরোার মতে, আমেরিকান সংধিান স্থিতিশীল নয়—গতিশীল, নিউটোনিয়ান নয়, ডারউইনিয়ান। অনেক রাষ্ট্রবীজ্ঞানী মনে করেন যে বাস্তবে আমেরিকার সংবিধান ব্রিটেনের সংবিধানের থেকেই সুপরিবর্তনীয়।

(৪) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ঃ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণকে অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক ধ্যানধারণার প্রতিফলন বলা যায়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটিকে আমেরিকার সংবিধান রচয়িতারা দেখেন। ঔপনিবেশিক শাসনে শাসকের স্বৈরাচার ও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণকে সংবিধান রচয়িতারা স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক মনে করেছিলেন। তাই ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও স্বৈরাচার থেকে মুক্তির জন্যই আমেরিকার সংবিধানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শাসন, আইন ও বিচারবিভাগের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ যাতে না থাকে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। এজন্য আমেরিকার সংবিধানে আইন, শাসন ও বিচারবিভাগীয় ক্ষমতার সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। মার্কিন সংবিধানের ১,২,৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে যথাক্রমে কংগ্রেস আইনবিভাগীয়, রাষ্ট্রপতি

শাসনবিভাগীয় এবং সুপ্রিম কোর্ট বিচারবিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপতি বা তাঁর ক্যাবিনেট সদস্যরা কেউই কংগ্রেসের সদস্য নন। কংগ্রেসে তাঁরা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে পারেন না, কংগ্রেসের কাছে তাঁদের কোনও দায়িত্বশীলতাও নেই। বিচারবিভাগও আমেরিকার আইন ও শাসনবিভাগের এক্তিয়ার থেকে মুক্ত ও স্বাধীন।

(৫) নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি ঃ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ফলে যাতে কোনও একটি বিভাগ স্বেচ্ছাচারীভাবে ক্ষমতার প্রয়োগ করতে না পারে, সেজন্য মার্কিন সংবিধানে প্রত্যেক বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অপর দুই বিভাগকে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়েই শাসন যন্ত্রে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। আমেরিকার সংবিধান তাই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতিটিকেও গুরুত্বপ্রদান করেছে। কোনও বিভাগই অনন্য ক্ষমতা ভোগ করেন না। কংগ্রেসের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকলেও রাষ্ট্রপতি সেই আইনে 'ভিটো' প্রয়োগ বা অসম্মতি জানাতে পারেন। রাষ্ট্রপতির হাতে শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত। কিন্তু সন্ধিচুক্তি সম্পাদন, গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ বা কোনও দেশের সঙ্গে যুদ্ধ ও শান্তি ঘোষণার ক্ষেত্রে সিনেট সভার দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদন প্রয়োজন। মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের বিচার সংক্রান্ত চরম ক্ষমতা থাকলেও কংগ্রেস তাদের ইম্‌পিচমেন্ট পদ্ধতি দ্বারা পদচ্যুত করতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট আবার কংগ্রেস প্রণীত আইন ও রাষ্ট্রপতির কাজকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। সংবিধানের ব্যাখ্যা নিয়ে কোনও মতবিরোধ দেখা দিলে সুপ্রিম কোর্ট তা মীমাংসার অধিকারী। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের আবার সেনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে থাকেন। এইভাবে সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক বিভাগ সরকারের তিনটি শাখা একে অন্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।

(৬) মৌলিক অধিকার ঃ মূল মার্কিন সংবিধানে মৌলিক অধিকার ছিল না। পরে প্রথম দশটি সংশোধনের মাধ্যমে মার্কিন সংবিধান মৌলিক অধিকারকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছে, যেমন, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আইনের দৃষ্টিতে সাম্য ইত্যাদি। এই দশটি সংশোধনকে মার্কিন নাগরিকদের 'অধিকারের সনদ' বলা হয়।

(৭) রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসন ঃ সংবিধান অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির হাতে শাসনবিভাগের পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির একক কর্তৃক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্রিটেনের মত শাসনবিভাগের দায়িত্ব যৌথভাবে ক্যাবিনেটের ওপর ন্যস্ত নয়। রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শদান করার জন্য একটি ক্যাবিনেট আছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্যাবিনেটের পরামর্শমত কাজ করতে বাধ্য নন। বস্তুত, ক্যাবিনেট সদস্যদের রাষ্ট্রপতি নিজেই ইচ্ছামত নিয়োগ করেন এবং যখন খুশি তাদের পদচ্যুত করতে পারেন। ক্যাবিনেটকে রাষ্ট্রপতির ভৃত্যের মত মনে করা যায়। ক্যাবিনেটের কংগ্রেসের কাছে কোনও দায়িত্বশীলতা নেই, ক্যাবিনেটের কোনও সাংবিধানিক মর্যাদাও নেই।

(৮) বিচারবিভাগের প্রাধান্য ঃ বিচারপতি হিউসের-এর (Hughes) মতে, ''We are under the Constitution, and the Constitution is what the judges say it is.'' (''আমরা সংবিধানের অধীন, এবং সংবিধান হল বিচারপতিগণ যে ব্যাখ্যা দেন, তাই।'') মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতাবলে শাসনবিভাগের কোনও কাজ বা আইনবিভাগ রচিত কোনও আইন সংবিধান বিরোধী মনে করলে সেই কাজ বা আইনকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। সংবিধানের শুরু থেকেই সুপ্রিম কোর্ট এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে আসছে। তাছাড়াও যে কোনও কাজ বা আইনকে বিচার করার সময় সুপ্রিম কোর্ট তার পদ্ধতিগত ও বস্তুগত উভয় দিকের বিচার করে। বস্তুগত বা নৈতিক দিকের বিচারের ফলে সুপ্রিম কোর্ট প্রভূত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে। এজন্য মার্কিন সুপ্রিম কোর্টকে পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী বিচারালয় বলা হয়। ব্রিটেনে পার্লামেন্টের আইনকে অবৈধ বলার ক্ষমতা আদালতের নেই। তাই সেখানে পার্লামেন্টের প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট যে কোনও আইন বা শাসনবিভাগীয় কাজকে অবৈধ বলার ক্ষমতাযুক্ত হওয়ায় সেখানে বিচারবিভাগের প্রাধ্যন্য লক্ষণীয়।

(৯) যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতি ঃ যুক্তরাষ্ট্র বলতে বোঝায় লিখিত সংবিধান দ্বারা কেন্দ্র ও অঙ্গারাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতাবন্টন, সংবিধানের প্রাধান্য ও নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের উপস্থিতি। মার্কিন সংবিধানে তিনটি বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করা যায়। স্ট্রং-এর (Strong) মতে, ''মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লিখিত সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। সংবিধানের ৬ নং ধারায় বলা হয়েছে যে মার্কিন সংবিধানই দেশের চরম ও প্রধান আইন। সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় কেন্দ্র ও অঙ্গারাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বন্টিত হয়েছে। কেন্দ্র ও অঙ্গারাজ্যের মদ্যে বিবাদ বা অঙ্গারাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদ মীমাংসা বা সংবিধান ব্যাখ্যার চরম ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টকে দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট হল নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত।

(১০) দ্বৈত নাগরিকতা ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা কেন্দ্র বা যুক্তরাষ্ট্রের এবং অন্যদিকে রাজ্যের নাগরিক। এই দুই ধরনের নাগরিকতার মধ্যে কোনও বিরোধ নেই।

(১১) রাজ্যগুলির স্বতন্ত্র সংবিধান ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার সম্বন্ধেই ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংবিধান শুধুমাত্র কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা ভাগ করে দিয়েছে। কেন্দ্রের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে অবশিষ্ট ক্ষমতা রাজ্যগুলিকে দিয়েছে। রাজ্যের সরকার কিভাবে চলবে তা রাজ্যের সংবিধান দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। প্রত্যেক রাজ্যের নিজস্ব সংবিধান আছে।

(১২) **অঙ্গারাজ্যগুলির সমতা** ঃ মার্কিন সংবিধানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সব ধরনের অঙ্গারাজ্যগুলির মধ্যে সমতার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। আয়তন নির্বশেষে প্রতিটি অঙ্গরাজ্য কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটে দুজন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারে।

(১৩) **দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা** ঃ মার্কিন আইনসভা ও কংগ্রেস দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। নিম্নকক্ষ বা জনপ্রতিনিধি সভায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং উচ্চকক্ষ বা সিনেটে সব রাজ্যের সমপ্রতিনিধিত্ব নীতি স্বীকৃত হয়েছে। প্রতিটি রাজ্য থেকে দুজন প্রতিনিধি সিনেট প্রেরিত হয়।

(১৪) **প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা ঃ** মার্কিন শাসনব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন করে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত কংগ্রেস (কেন্দ্রীয় স্তরে) এবং বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভাগুলি (রাজ্যস্তরে)। শাসনবিভাগের প্রধান রাষ্ট্রপতি (কেন্দ্রীয় স্তরে) এবং রাজ্যপাল (রাজ্যস্তরে) নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত হন।

(১৫) **সীমাবদ্ধ শাসনব্যবস্থা ঃ** সরকার যাতে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে না পারে সেজন্য মার্কিন সংবিধান সরকারি ক্ষমতার ওপর কতকগুলি বাধানিষেধ স্থাপন করেছে। যেমন, সরকার ব্যাক্তির অধিকার হরণ করতে পারবে না। কিছু বিষয়ের ওপর কেন্দ্রীয় সরকার এবং কিছু বিষয়ের ব্যাক্তির অধিকার হরণ করতে পারবে না। কিছু বিষয়ের ওপর কেন্দ্রীয় সরকার এবং কিছু বিষয়ের ওপর রাজ্য সরকারের ক্ষমতা আছে। আইন, শাসন ও বিচারবিভাগ পরস্পরকে নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ভারসাম্য কক্ষা করে, কেউই অপরের সম্মতি ছাড়া কাজ করতে পারে না। আবার একমত হয়ে তারা কাজ করলেও সুপ্রিম কোর্ট তা বাতিল করে দিতে পারে।

০৫.৫ সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি

সামাজিক দলিল হিসাবে সংবিধান একটি নির্দিষ্ট সময়ে সামাজিক সমস্যার সমাধান ও সমাজের সামগ্রিক উন্নতিবিধানের জন্য রচিত হয়। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থা ও তার সমস্যাদির চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটে। তাই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গো সঙ্গো প্রয়োজনের তাগিদে সংবিধানেরও সংশোধন করতে হয়। অন্যান্য দেশের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে।

সংবিধানের ৫নং ধারায় সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতিটি বর্ণিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ আইনপাশের পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধন করা যায় না। এজন্য বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। সংবিধানে সংবিধান সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপনের দুটি পদ্ধতি এবং প্রস্তাবটি অনুমোদনের দুটি পদ্ধতি কথা বলা হয়েছে।

সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের দুটি পদ্ধতি হল ঃ

(i) কংগ্রেসের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপিত হতে পারে।

অথবা

(ii) দুই-তৃতীয়াংশ অঙ্গারাজ্যের আইনসভাসমূহের অনুরোধক্রমে আহূত একটি কনভেনশন বা সভায় সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপিত হতে পারে।

সংবিধান সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদনের দুটি পদ্ধতি হল ঃ

(i) অঙ্গারাজ্যগুলির আইনসভাগুলির তিন-চতুর্থাংশ দ্বারা অনুমোদিত হলে সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অথবা

(ii) সংবিধান সংশোধনের উদ্দেশ্যে অঙ্গারাজ্যগুলির আহূত কনভেনশনের তিন-চতুর্থাংশ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তবেই তা গৃহীত হতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে ঃ

(১) সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির ভূমিকা বিশেষভাবে স্বীকৃতিলাভ করেছে। সংবিধান সংশোধনের যে কোনও প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষমতা যেমন তাদের আছে, তেমনি তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গারাজ্যের সম্মতি ছাড়া কোনও প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষমতা যেমন তাদের আছে, তেমনি তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গারাজ্যের সম্মতি ছাড়া কোনও সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হতে পারে না। মার্কিন সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের একক প্রাধান্যের বদলে তাই কেন্দ্র ও অঙ্গারাজ্যগুলির যৌথ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক-চতুর্থাংশের বেশি রাজ্য কোনও সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করলে সেই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

(২) কংগ্রেস কোনও সংশোধনী প্রস্তাব অঙ্গারাজ্যগুলির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে অস্বীকার করলে দুই-তৃতীয়াংশ রাজ্য আইনসভার আবেদন ক্রমে কংগ্রেস একটি সাংবিধানিক কনভেনশন আহ্বান করতে বাধ্য। এই কনভেনশন সংশোধনী প্রস্তাবটিকে অনুমোদনের জন্য অঙ্গারাজ্যগুলির আইনসভাগুলির কাছে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলে কংগ্রেস সেই সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য।

(৩) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতির বদলে বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা আমেরিকার সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থাটি সংবিধানটিকে দুষ্পরিবর্তনীয় প্রকৃতি দান করেছে।

(৪) সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাবে তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গারাজ্যের সম্মতি আবশ্যিক ঘোষণা করা হলেও কতদিনের মধ্যে রাজ্যগুলিকে মতামত জানাতে হবে যে সম্পর্কে সংবিধানে কিছু বলা হয়নি। সুপ্রিম কোর্ট এই সময়সীমা নির্ধারণের দায়িত্ব কংগ্রেসকে দেওয়ার বর্তমান প্রতিটি সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যেই সময়সীমা স্থির করে দেওয়া হয়। কিন্তু কোনও সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাবে রাজ্যগুলির মতামত জ্ঞাপনের সময়সীমা যদি কংগ্রেস ঠিক করে না দেয়, সেক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। সুপ্রিম কোর্ট কোলম্যান বনাম মিলারের মামলায় (১৯৩৯) রায় দিয়েছে যে এরূপ ক্ষেত্রে সংশোধনী প্রস্তাবটি অনির্দিষ্টকাল রাজ্যগুলির কাছে পড়ে থাকবে।

(৫) কোন সংশোধনী প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যের গভর্নরদের সম্মতি প্রয়োজন কিনা সে সম্পর্কে সংবিধান কিছু বলেনি। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের আগে বা অনুমোদিত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি বা গভর্নরদের সম্মতির কোনও প্রয়োজন নেই।

(৬) সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব কংগ্রেসের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় গৃহীত হতে হয়। দুই-তৃতীয়াংশ বলতে মোট সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ বা উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশকে বোঝায়।

সমালোচনা ঃ মার্কিন সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতির নিম্নলিখিত সমালোচনাগুলি উল্লেখযোগ্য—

(i) মার্কিন সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল হওয়ায় তা যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে সক্ষম নয়। কংগ্রেসের দুটি কক্ষে দুটি রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে যে কোনও সংশোধনী প্রস্তাবে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তিন-চতুর্থাংশ রাজ্য আইনসভার সম্মতি আদায়ও খুব সহজ নয়। তাই অনেক সমালোচক সংবিধান সংশোধনের আরও সহজ পদ্ধতি প্রবর্তনের কথা বলেন।

(ii) অনুমোদনের জন্য সংশোধনী প্রস্তাবকে জনগণের কাছে পেশ করার বদলে রাজ্য আইন-সভাগুলির কাছে পেশ করাকে অনেকে অগণতান্ত্রিক মনে করেন।

(iii) সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব কংগ্রেস এবং ৩৭ টি বৃহৎ রাজ্যের আইনসভা (অর্থাৎ তিন-চতুর্থাংশ থেকে একটি কম) দ্বারা অনুমোদিত হলেও কোনও একটি সংশোধনী প্রস্তাব কার্যকর হতে পারে না। অর্থাৎ ৫০ টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে স্বল্প জনসংখ্যাবিশিষ্ট ছোট ১৩টি রাজ্যের আইনসভা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেকোনও সংশোধনী প্রস্তাবকে বাতিল করে দিতে পারে।

(iv) সংশোধনী প্রস্তাবে রাজ্য আইনসভাগুলির মতামত জ্ঞাপনের কোনও সময়সীমার উল্লেখ সংবিধানে না থাকায় অসুবিধা দেখা দেয়। কংগ্রেস সময়সীমা নির্ধারণ করে কোনও প্রস্তাব না নিলে সংশোধনী প্রস্তাব রাজ্য আইনসভাগুলির কাছে অনির্দিষ্ট কাল পড়ে থাকতে পারে।

মার্কিন সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিটি জটিল ও কষ্টসাধ্য হওয়ায় দুশো বছরের বেশি সময়ের মধ্যে এটি মাত্র ২৬ বার সংশোধিত হয়েছে। তবে বিচারালয়ের রায়, কংগ্রেস প্রণীত আইন, শাসনতান্ত্রিক প্রথা ও রীতিনীতি এবং শাসক প্রধানের যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে আমেরিকার সংবিধান সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।

০৫.৬ ব্রিটেন ও আমেরিকার সংবিধানের তুলনা

ব্রিটেন ও আমেরিকার সংবিধানের তুলনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

(i) ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত, কিন্তু আমেরিকার সংবিধান লিখিত।

(ii) ব্রিটেনের সংবিধান সুপরিবর্তনীয় এই সংবিধানকে পরিবর্তনের জন্য কোনও জটিল পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সাধারণ আইনপাশের পদ্ধতির মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করতে পারে। সাধারণ আইনপাশের পদ্ধতি বলতে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটকে বোঝায়। অর্থাৎ ব্রিটেনের সংবিধান পরিবর্তনের জন্য কোনও বিশেষ পদ্ধতি নেই। কিন্তু আমেরিকার সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতিতে (অর্থাৎ সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে) এই সংবিধানের পরিবর্তন সম্ভব নয়। আমেরিকার সংবিধান সংশোধনের জন্য বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন।

(iii) ব্রিটেনে সাধারণ আইনপাশের পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধন করা যায় বলে ব্রিটেনের সাংবিধানিক আইনের আলাদা কোনও মর্যাদা নেই। কিন্তু আমেরিকার সংবিধান সংশোধনের বিশেষ পদ্ধতি থাকায় আমেরিকার সাংবিধানিক আইনের মর্যাদা সাধারণ আইনের ওপরে।

(iv) ব্রিটেনের পার্লামেন্ট সার্বভৌম। তাই পার্লামেন্টের আইনগত ক্ষমতার ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। পার্লামেন্ট যে কোনোও আইন প্রণয়ন বা বাতিল করতে পারে। আদালতের পার্লামেন্টের আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা আছে। সংবিধান বিরোধী বা ন্যায় নীতিবিরোধী যে কোনও আইন বা শাসনবিভাগীয় কাজকে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল ঘোষণা করতে পারে। অর্থাৎ ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় পার্লামেন্টের প্রাধান্য আর আমেরিকার শাসনব্যবস্থায় বিচারবিভাগের প্রাধান্য দেখা যায়।

(v) ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি মানা হয় না। পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যরাই সেখানে মন্ত্রীসভা গঠন করে। রাজা বা রানিও একদিকে শাসনবিভাগের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ অন্যদিকে পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। লর্ড চ্যান্সেলর একাধারে মন্ত্রীপরিষদের সদস্য, লর্ডসভার সভাপতি এবং বিচারালয়ের একজন বিচারপতি। পার্লামেন্ট অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করলে মন্ত্রীদের পদচ্যুত হতে হয়। মন্ত্রসভাও পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে পারে। কিন্তু মার্কিন সংবিধানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে আইন, শাসন ও বিচারের ক্ষমতা যথাক্রমে কংগ্রেস, রাষ্ট্রপতি ও সুপ্রিম কোর্টের হাতে। তিনটি বিভাগই একে অন্যের প্রভাব থেকে মুক্ত। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের সদস্য হতে পারেন না, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিতে পারেন না, আইনসভার কাছে দায়িত্বশীলও নয়।

(vi) ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমেরিকায় শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয়। এখানে সংবিধান অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করে দেওয়া হয়েছে, নিজ এলাকায় প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে কাজ করে। কারও অস্তিত্ব অন্যের ওপর নির্ভর করে না।

(vii) ব্রিটেনের রাজা বা রানি নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে কাজ করেন। কিন্তু প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ভোগ করে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন ক্যাবিনেট। আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক ও প্রকৃত শাসক—উভয় ধরনের ক্ষমতাই ভোগ করেন।

(viii) ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ক্যাবিনেট প্রকৃত শাসনক্ষমতা ভোগ করে। প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত শাসক হিসাবে কাজ করার সময় ক্যাবিনেটের মন্ত্রীদের সহযোগিতা পান। কিন্তু প্রকৃত শাসক হিসাবে রাষ্ট্রপতির মত কেউ নেই। রাষ্ট্রপতি একক শাসক। রাষ্ট্রপতি কাজের সুবিধার জন্য ক্যাবিনেট মন্ত্রী নিয়োগ করেন। কিন্তু ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের কোন সাংবিধানিক মর্যাদা নেই, তাঁরা রাষ্ট্রপতির ভৃত্যের মত। শাসনবিভাগের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতিকে একাকী বহন করতে হয়।

(ix) ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা পার্লামেন্টারি, কিন্তু আমেরিকায় রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসন প্রবর্তিত। তবে উভয় দেশেই উদারনৈতিক গণতন্ত্র এবং ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত। উভয় দেশেই দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল ও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা আছে এবং উভয় দেশেই জনগণের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। ব্রিটেনের সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতি নির্ভর হলেও সেখানে প্রথা ও রীতিনীতির পাশাপাশি কিছু লিখিত পার্লামেন্ট রচিত আইনও আছে যেগুলি সাংবিধানিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আবার আমেরিকার সংবিধান লিখিত হলেও সেখানে কিছু অলিখিত প্রথা ও রীতিনীতি সাংবিধানিক গুরুত্ব লাভ করেছে। যেমন ক্যাবিনেট প্রথা। তাই উভয় সংবিধানের কিছু পার্থক্য থাকলেও কিছু মিলও আছে।

০৫.৭ সারাংশ

আলোচ্য এককে আমেরিকার সংবিধানের রচনা, তার ঐতিহাসিক পটভূমি, সংবিধানের বিকাশের বিভিন্ন দিক, সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ও সংশোধন পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে।

ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসাবে আমেরিকার ১৩ টি উপনিবেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিচালনা করে এবং ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৭৭৭ সালে তারা একত্রিত হয়ে রাষ্ট্রসমবায় গঠন করে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকরা তাদের স্বাধীনতা লাভ করার পর তারা রাষ্ট্রসমবায়ের দুর্বলতা ও অনৈক্য থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নতুন সংবিধান রচনার জন্য ফিলাডেলফিয়ায় কনভেনশন ডাকে। ১৭৮৯ সালে আমেরিকার নতুন সংবিধান চালু করা হয়।

সংবিধানটি ছিল ক্ষুদ্র আকারের। পরে সংশোধন, বিচারের রায়, রীতিনীতি ও প্রথা, কংগ্রেস প্রণীত আইন ও রাষ্ট্রপতিদের সুযোগ্য নেতৃত্বের দ্বারা সংবিধানটি বিস্তৃত ও বিকশিত হয়।

আমেরিকার সংবিধানটি লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি, জনগণের সার্বভৌমত্ব, যুক্তরাষ্ট্র, রাষ্ট্রপতির শাসন, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ইত্যাদি আমেরিকার সংবিধানের বৈশিষ্ট্য।

আমেরিকার সংবিধানের সংশোধন ব্যবস্থা জটিল। সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হতে পারে কংগ্রেসের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বা দুই-তৃতীয়াংশ অঙ্গারাজ্যগুলির অনুরোধে আহুত কনভেনশনে। সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদিত হয় যদি অঙ্গারাজ্যগুলির আইনসভার তিন-চতুর্থাংশ সেই প্রস্তাব সমর্থন করে বা সংবিধান

সংশোধনের উদ্দেশ্যে অঙ্গারাজ্যগুলি দ্বারা আহুত কনভেনশনের তিন-চতুর্থাংশ সমর্থন করে। আমেরিকার সংবিধানটি দুষ্পরিবর্তনীয় এবং সংবিধান সংশোধনে রাজ্যগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটেন ও আমেরিকা উভয়েই উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক দেশ। উভয় দেশেই নাগরিক অধিকার স্বীকৃত, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ও দুটি রাজনৈতিক দল উভয় দেশেই দেখা যায়। তবে আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি শাসন আর ব্রিটেনে সাংসদীয় শাসন। আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র আর ব্রিটেন এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা। আমেরিকার সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় আর ব্রিটেনের অলিখিত ও সুপরিবর্তনীয়। তাই উভয় দেশের সংবিধানের মধ্যে পার্থক্যও বিস্তর।

আলোচ্য এককটি আপনাদের আমেরিকার শাসনব্যবস্থার মূল নীতিসমূহ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করবে।

০৫.৮ প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। আমেরিকার সংবিধানের ঐতিহাসিক পটভূমিকা আলোচনা করুন।

২। আমেরিকার সংবিধানের বিকাশের বিভিন্ন উপায়গুলি কী কী?

অথবা, কী কী উপায়ে আমেরিকার সংবিধান পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সঙ্গতি বিধানে সক্ষম হয়েছে?

৩। আমেরিকার সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

৪। আমেরিকার সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতিটি আলোচনা করুন।

৫। ব্রিটেন ও আমেরিকার সংবিধানের পার্থক্যগুলি দেখান।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) কবে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষিত হয়?

(খ) কবে আমেরিকার রাষ্ট্রসমবায় গঠিত হয়?

(গ) কখন আমেরিকার উপনিবেশগুলি স্বাধীন হয়?

(ঘ) কোন সালে আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান গৃহীত হয়?

(ঙ) আমেরিকার সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় বলা হয় কেন?

(চ) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটি কিভাবে আমেরিকার সংবিধানে কার্যকর করা হয়েছে?

(ছ) নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি বলতে কী বোঝেন? আমেরিকার সংবিধানে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি কিভাবে কার্যকর করা হয়?

(জ) আমেরিকার বিচারবিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলতে কী বোঝেন।

(ঝ) আমেরিকায় কি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয়েছে? কিভাবে?

(ঞ) আমেরিকার সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির একটি সমালোচনা লিখুন?

(ট) ব্রিটেন ও আমেরিকার শাসনব্যবস্থায় কী কী মিল দেখতে পাওয়া যায়?

০৫.৯ উত্তরমালা

১। ০১.২ দেখুন

২। ০১.৩ - এ উত্তর আছে।

৩। ০১.৪

৪। ০১.৫ দেখুন।

৫। ০১.৬

(ক) ৪ঠা জুলাই, ১৭৭৬ সালে।

(খ) ১৭ ই নভেম্বর, ১৭৭৭ সালে

(গ) ১৭৮৩ সালে।

(ঘ) ১৭৮৯ সালে।

(ঙ) ০৫.৪-এর ৩নং বৈশিষ্ট্যটি দেখুন।

(চ) ০৫.৪ - এর ৪নং বৈশিষ্ট্যটি দেখুন।

(ছ) ০৫.৪ - এর ৫নং বৈশিষ্ট্যটি দেখুন।

(জ) ০৫.৪ - এর ৮নং বৈশিষ্ট্যটি দেখুন।

(ঝ) হ্যাঁ। বাকি উত্তরের জন্য ০৫.৪ এবং ৯ নং বৈশিষ্ট্য দেখুন।

(ঞ) ০৫.৫ -এর সমালোচনা অংশ ৯১ পাতা থেকে যে কোনও একটি লিখুন।

(ট) ০৫.৬ অনুসরণ করুন।

০৫.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। Munro, W.B : The Government of the United States.

২। Ogs, F.A. & Ray, P.O. : Essentials of America Government.

৩। Potter, Allen M : American Government and politics.

৪। Beard C.A. : American Government and Politics.

৫। অনাদিকুমার মহাপাত্র ঃ নির্বাচিত শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি।

একক ০৬ ❑ আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রতি ও কংগ্রেস

গঠন

০৬.১ উদ্দেশ্য
০৬.২ প্রস্তাবনা
০৬.৩ রাষ্ট্রপতির যোগ্যতা, কার্যকালের মেয়াদ ইত্যাদি
০৬.৪ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি
০৬.৫ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী
রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা
রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ক্রমবিকাশ
০৬.৬ কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলী
কংগ্রেসের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা
০৬.৭ কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলী
কংগ্রেসের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা
০৬.৮ রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের সম্পর্ক
০৬.৯ সারাংশ
০৬.১০ প্রশ্নাবলী
০৬.১১ উত্তরমালা
০৬.১২ গ্রন্থপঞ্জী

০৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হ'ল আমেরিকার শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের স্থান, ক্ষমতা ও ভূমিকা সম্বন্ধে আপনাকে অবহিত করা। এককটি পড়ে আপনি আয়ত্ব করতে পারবেন—

- আমেরিকার রাষ্ট্রপতির যোগ্যতা, কার্যকালের মেয়াদ ইত্যাদি;
- আমেরিকার রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি;
- আমেরিকার রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, কার্যাবলী, সীমাবদ্ধতা এবং তাঁর ক্ষমতার ক্রমাবিকাশ;
- মার্কিন কংগ্রেসের গঠন;
- মার্কিন কংগ্রেসের ক্ষমতা, কাজ ও সীমাবদ্ধতা;
- মার্কিন কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন পদ্ধতি;

- রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের সম্পর্ক

এগুলি সম্বন্ধে অবহিত হলে আপনি আমেরিকার শাসনব্যবস্থার মূল নীতিগুলির সঙ্গে পরিচিত হবেন।

০৬.২ প্রস্তাবনা

১৭৮৯ -এ রচিত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অনুযায়ী আমেরিকায় শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি আইনবিভাগীয় ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি চার বছরের জন্য নির্বাচিত হল এবং দু-বারের বেশি নির্বাচিত হতে পারেন না। রাষ্ট্রপতিকে ইম্‌পিচমেন্ট পদ্ধতির সাহায্যে পদচ্যুত করা যায়। সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হন। অঙ্গারাজ্যের জনগণ নির্বাচক সংস্থার সদস্যদের নির্বাচিত করেন এবং নির্বাপক সংস্থার সদস্যরা রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করেন। দলপ্রথার উদ্ভবের ফলে এই নির্বাচন প্রত্যক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাষ্ট্রপতির শাসন, আইন, অর্থ এবং জরুরি অবস্থাকালীন ক্ষমতা আছে। রাষ্ট্রপতির ভূমিকাকে আলোচনা করা যায় চারভাবে—দলনেতা, রাষ্ট্রপ্রধান, জনগনের প্রতিনিধি এবং বিশ্ব রাজনীতির নিয়ামক হিসাবে। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অসীম হলেও রাষ্ট্রপতিকে একনায়ক বলা যায় না। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণগুলি হল কংগ্রেস, দলব্যবস্থা, জনমত, বিচারবিভাগ, আমলাতন্ত্র, শাসনতান্ত্রিক ও শাসনবহির্ভূত রীতিনীতি এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাসমূহ।

রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক ক্ষমতার পাশাপাশি সংবিধান বহির্ভূতভাবেও কিছু ক্ষমতা দেখা যায়। বিচারের রায়, কংগ্রেসের সমর্থন, দলব্যবস্থা, যুদ্ধ ও সংকটে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা, জনমতের সমর্থন, সরকারি দায়দায়িত্বের প্রসার এবং বিভন্ন রাষ্ট্রপতিদের দক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার প্রসার ঘটিয়েছে।

কংগ্রেস জনপ্রতিনিধিসভা ও সেনেট নিয়ে গঠিত হয়। জনপ্রতিনিধিসভায় জনগণের প্রতিনিধি এবং সেনেটে রাজ্যের প্রতিনিধিরা থাকেন। কংগ্রেসের ক্ষমতা হল ঃ আইন প্রণয়ন, সংবিধান সংশোধন, নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ, বিচার সংক্রান্ত কাজ, শাসন সংক্রান্ত কাজ, নির্দেশমূলক ও তত্ত্বাবধান, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, তদন্ত, যুদ্ধ এবং তথ্য সরবরাহ। নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি দ্বারা কংগ্রেসের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। সংবিধানে কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার আলোচনা আছে।

নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির ফলে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করে, কংগ্রেসও রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে উভয়ের সম্বন্ধ সহযোগিতা মূলক।

০৬.৩ রাষ্ট্রপতির যোগ্যতা, কার্যকালের মেয়াদ ইত্যাদি

মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে নিম্নলিখিত যোগ্যতার অধিকারী হতে হয়-

(i) অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাভাবিক নাগরিক হতে হবে।

(ii) অন্তত ৩৫ বছর বয়স্ক হতে হবে।

(iii) অন্তত ১৪ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতে হবে। এই বসবাসগত যোগ্যতাকে কেন্দ্র করে হার্বার্ট হুভারের রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় বিতর্ক ওঠে। হুভারে একাদিক্রমে ১৪ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেননি। সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে একাদিক্রমে ১৪ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করার প্রয়োজন নেই।

১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ কতদিন হওয়া উচিত সে নিয়ে মতানৈক্য ঘটে। অনেকে ৭ বছর মেয়াদের কথা বলেন এবং পুনর্নির্বাচনের বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ ৪ বছর করা হয়। কিন্তু সংবিধানে তাঁর পুনর্নির্বাচনের ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতি হতে অস্বীকার করলে তখন থেকে এই শাসনতান্ত্রিক রীতি গড়ে ওঠে যে রাষ্ট্রপতি দুবারের বেশি নির্বাচিত হতে পারবেন না। জেনারেল গ্রান্ট ও থিওডোর রুজভেল্ট এই রীতিটিকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। গ্রান্ট রাষ্ট্রপতি হতে চাইলেও পদে নির্বাচিত হন। তবে ১৯৫১ সালে সংবিধানের ২২ তম সংশোধন দ্বারা সমস্যাটির সমাধান করা হয়েছে। ওই সংশোধন অনুসারে কোনও রাষ্ট্রপতি তৃতীয়বারের জন্য ওই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে তাঁর মৃত্যু হলে বা তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে বা তাঁকে পদচ্যুত করা হলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হয়। তখন উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির যাবতীয় কাজ সম্পাদন করেন। দেশদ্রোহিতা, উৎকোচগ্রহণ, দুর্নীতিমূলক বা বেআইনি কাজের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত কার যেতে পারে। ইমপিচমেন্ট পদ্ধতির সাহায্যে তাঁকে পদচ্যুত করা যায়। এই পদ্ধতি অনুসারে কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধিসভায় অভিযোগ উত্থাপিত হয় এবং সেনেট সেই অভিযোগের বিচার করে। এই বিচারের সময় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সভাপতি হিসাবে কাজ করেন। জনপ্রতিনিধিসভার অধিকাংশ সদস্য অভিযোগটি সমর্থন করার পর সেটি সেনেটে বিচারের জন্য যায়। সেনেটের উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ অভিযোগটি সমর্থন করলে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হন।

রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হওয়ার পর উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হন। কিন্তু তখন যদি উপরাষ্ট্রপতির মৃত্যু ঘটে, বা তিনি পদত্যাগ বা পদচ্যুত হন তাহলে আবার রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হয়। এই শূন্যপদ পূরণের ব্যাপারে সংবিধানে কিছু বলা হয়নি। এ ব্যাপারে ১৭৯২ সালে মার্কিন কংগ্রেস এই আইন রচনা করে এবং এই আইন অনুসারে তখন প্রতিনিধিসভার অধ্যক্ষ রাষ্ট্রপতি হিসেবে কাজ করবেন। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেস নতুন আইন করে। এই আইন অনুসারে উপরাষ্ট্রপতির পর সেক্রেটারি অফ স্টেট, তারপর প্রতিরক্ষা সচিব, তার পর অ্যাটর্নি জেনারেল প্রভৃতি রাষ্ট্রপতির কার্যভার গহণ করবেন।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি কিছু সাংবিধানিক অব্যাহতি ভোগ করেন। রাষ্ট্রপতির কার্যকালে তাঁর বিরুদ্ধে দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা করা যাবে না, আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা যাবে না এবং কংগ্রেসের কোনও কমিটির সামনে তাঁকে হাজির হতে বাধ্য করা যাবে না। ইম্‌পিচমেন্ট ছাড়া অন্যভাবে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।

০৬.৪ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি

রাষ্ট্রপতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ফিলাডেলফিয়া কনভেনশনে তুমুল বাক্‌বিতন্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকে জনগন কর্তৃক রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কথা বলেন। অনেকে আবার কংগ্রেস দ্বারা রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের কথা বলেন। সংবিধান প্রণেতারা দুটি প্রস্তাবের কোনওটিই গ্রহণ করেননি। প্রথম পদ্ধতিটি গ্রহণ করলে রাষ্ট্রপতিকে সব সময় জনগনের সন্তুষ্টিবিধানে ব্যস্ত থাকতে হবে আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতির কংগ্রেসের হাতের পুতুলে পরিণত হওয়ার এবং ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ক্ষুন্ন হওয়ার আশংকা ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত নির্বাচন সংস্থা দ্বারা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিশেষ পদ্ধতিটি সংবিধানে গৃহীত হয়।

সংবিধানের ২নং ধারায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতিটি আলোচিত হয়েছে। এই নির্বাচন পদ্ধতির দুটি পর্যায় আছে-প্রথম পর্যায় হল নির্বাচক সংস্থা গঠন এবং দ্বিতীয় পর্যায় হল নির্বাচক সংস্থায় সদস্যদের দ্বারা রাষ্ট্রপতির নির্বাচন। প্রথম পর্যায়ে-প্রত্যেক অঙ্গারাজ্যের নাগরিকরা নির্বাচক সংস্থার সদস্যদের নির্বাচন করেন। কংগ্রেসের উভয় কক্ষে অঙ্গারাজ্যের যতজন প্রতিনিধি আছে সেই অঙ্গারাজ্যের নাগরিকরা ততজন সদস্যকে নির্বাচিত করেন। তবে কংগ্রেসের কোনও সদস্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও কর্মচারী নির্বাচক সংস্থার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হতে পারেন না। পঞ্চাশটি অঙ্গারাজ্য থেকে নির্বাচিত সব সদস্যদের নিয়ে নির্বাচনী সংস্থা গঠিত হয়। নভেম্বর মাসের প্রথম সোমবারের পর প্রথম যে মঙ্গলবার আসে, সেই দিন নির্বাচক সংস্থার প্রতিনিধিদের নির্বাচন করার জন্য ভোট অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়—পরবর্তী ডিসেম্বর মাসের প্রথম বুধবার পর প্রথম সোমবার প্রত্যেক অঙ্গ রাজ্যের নির্বাচক সদস্যরা নিজ নিজ অঙ্গারাজ্যে মিলিত হয়ে গোপন ভোটদান পদ্ধতি অনুযায়ী নির্বাচনের জন্য ভোটদান করেন। সংবিধানের ২৩ তম সংশোধনের ফলে বর্তমানে নির্বাচক সদস্যরা নিজ নিজ জেলায় উপস্থিত হয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। নির্বাচন পর্ব শেষ হওয়ার পর ভোটবাক্সগুলিকে সিল করে ওয়াশিংটনে পাঠানো হয়। পরের বছর ৬ই জানুয়ারি সেনেটের অধ্যক্ষ সিনেট সদস্যদের সামনে ভোটপত্রগুলি গণনা করেন। যিনি নির্বাচক সংস্থার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট লাভ করেন, তিনি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি পদে যদি কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পান তাহলে অধিক ভোট পেয়েছেন এমন অনধিক তিনজন প্রার্থীর মধ্যে থেকে একজনকে জনপ্রতিনিধিসভা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করে।